রূপে তোমায় ভোলাবো

সোমেশ্বর ভৌমিক

আমরা বই পড়ি, সিনেমা দেখি। অবশ্য এক সময় বাঙালি সমাজে সিনেমা দেখাকে বলা হত ‘বই দেখা’। সাহিত্যের অনুসরণে তৈরি কাহিনীচিত্রকে ভাবা হত দৃশ্যগ্রাহ্য সহজপাঠ। বইয়ের পাতায় পাতায় উন্মোচিত ঘটনাক্রমের ধারাপ্রদর্শনী। তাই ‘বই দেখা’। এভাবে দেখতে দেখতে হয়ত বই পড়ার আনন্দই পেতেন দর্শক। কালক্রমে অবশ্য তাঁরা উপলব্ধি করলেন, সাহিত্যের ভিত্তিতে তৈরি চলচ্চিত্রেরও থাকতে পারে নিজস্ব এক ধর্ম। তাছাড়া, তাঁরা একথাও বুঝলেন, সাহিত্যনির্ভরতাই নয় চলচ্চিত্রের অস্তিত্বের একমাত্র শর্ত। সাহিত্যের বাইরেও ছড়ানো আছে চলচ্চিত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক উপাদান। চলচ্চিত্র হল তিলোত্তমা — এক স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যম। ফলে বই নয়, ছবি। আরো ভালো করে বললে, সিনেমা। এর রস পাওয়া যায় চোখ মেলে দেখায়। আজকাল অবশ্য সিনেমা ‘পড়া’-ও হচ্ছে। না, আমি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যে ফিল্ম স্টাডিজ হয়, তার কথা বলছি না। ‘সিনেমা পড়া’ হল ‘সিনেমা দেখা’-রই রকমফের। তবে একটু গুগম্ভীর। কারণ, গড়পড়তা দর্শক নন, পোলি পর্দার বুকে সিনেমা ‘পড়ছেন’ তত্ত্বজ্ঞানে জারিত অভিজ্ঞ মানুষের দল। তাঁদের চেষ্টায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা আর সহজ সংবেদনের বাইরে সিনেমাকে ঘিরে তৈরি হচ্ছে বোধ আর বিশ্লেষণের এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র।

সিনেমাকে ঘিরে বহুস্তরের মানবিক অভিজ্ঞতার এই যে বিস্তার, তার আছে নানা উপাদান — দৃশ্যগত, ধ্বনিগত, স্থানগত বা কালগত। এসবের মধ্যে জায়গা করে নেয় সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি বা এমনকি দর্শনেরও প্রসঙ্গ। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সিনেমার বহুমাত্রিকতা সত্ত্বেও তার ভরকেন্দ্রটি নিহিত আছে দৃশ্যের মধ্যে। দৃশ্যই সিনেমার মধ্যমণি। সিনেমাকে ঘিরে বিষয় বা প্রসঙ্গের এই বিবিধতার মধ্যে থেকে আলোচনার জন্যে আমরা বেছে নেব দৃশ্যকে। আর এখানে আমরা ছুঁয়ে যাব তিন ধরনের দৃষ্টিকোণ — নির্মাতার, সাধারণ দর্শকের আর বিশেষজ্ঞের ।

মূল আলোচনায় ঢোকার আগে বুঝে নেওয়া যাক, কাকে বলে সিনেমা। সিনেমা যে আদতে দর্শনধারী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কী তার বিশেষ লক্ষণ? রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘ছায়াচিত্র জিনিসটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ।’ কথাটা সংক্ষেপে বলা। কিন্তু এই অল্প পরিসরেও বোঝানো হয়ে গেছে অনেক কিছু। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে কথাটাকে ধরলে ফিরে যেতে হবে এডওয়ার্ড মুইব্রিজের জমানায়। সমান দূরত্বে পর পর সাজানো চব্বিশটি ক্যামেরায় গতিশীল কোনো বস্তুর (বা প্রাণীর) পর্যায়ক্রমিক অবস্থান ধরে রাখার পর একটি নির্দিষ্ট গতিতে ছবিগুলি দেখিয়ে উনি তৈরি করেছিলেন একটি সজীব দৃশ্যের বিভ্রম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন ‘গতিপ্রবাহ’ শব্দবন্ধটি প্রয়োগ করেন, তখন তার মধ্যে শুধু উন্মোচিত দৃশ্যটির গতি বা সজীবতার কথাই বলা হয় না, সেই প্রবাহের মধ্যে যে অর্থপূর্ণ নিরবচ্ছিন্নতা অন্তর্নিহিত থাকে তার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। অর্থাৎ সিনেমায় দৃশ্য বা দ্রষ্টব্যের গতিময়তাই সব নয়, এমনকি প্রধানও নয় —সিনেমার তাৎপর্য তৈরি হয় দৃশ্যের অর্থকে ঘিরে। আমাদের সমসাময়িক একজন পন্ডিত বলেছেন, ‘যথাযথ ধারাবাহিকতায় সাজানো একগুচ্ছ স্থিরচিত্রের সাহায্যে যে আপাত-গতিময় এবং অর্থপূর্ণ দৃশ্যমালা রচনা করা হয়, তারই নাম সিনেমা।’ এই সংজ্ঞাটিকে অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি, সব সিনেমাই আপাত-গতিময় দৃশ্যমালায় তৈরি, কিন্তু আপাত-গতিময় সব দৃশ্যমালাই সিনেমা নয়। আপাত-গতিময় কোনো দৃশ্যমালা যখন অর্থবাহী হয়ে ওঠে, কেবল তখনই তাকে বলা যাবে সিনেমা। দৃশ্যমালা আর সিনেমার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজটি করে দৃশ্যের অর্থময়তা। ফলে সিনেমাকে এক অর্থে বলা চলে

দৃশ্যের মধ্যে অর্থের সংযোজন বা দৃশ্যের মধ্যে অর্থের অনুসন্ধানের এক ধারাবাহিক পদ্ধতি।

কিন্তু, কেমন করে তৈরি হয় দৃশ্যের অর্থ? কেমন করে উদ্ধার হয় দৃশ্যের তাৎপর্য? সিনেমার শতাধিক বছরের ইতিহাসে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে দৃশ্যের মাধ্যমে অর্থ তৈরির ঐতিহ্য, এবং একই সঙ্গে দৃশ্যের তাৎপর্য উদ্ধারেরও ধারা। এমন নয় যে, খুব সরলরৈখিক কোনো বিবর্তনের নজির পাওয়া যাবে এখানে। তাই, কিছুটা সময়ানুক্রমিক, আর কিছুটা প্রয়োজনভিত্তিক একটা নক্‌শায় আমরা সাজিয়ে নেব বিষয়টিকে।

রূপের উদ্‌ভাস

আদিযুগের সিনেমার কাল বলে যে সময়টাকে চিহ্নিত করা হয়, সেই সময়সীমায় (১৮৯৬-১৯১৫) সাধারণভাবে একটি শটেই এক টা গোটা দৃশ্য বা ঘটনাকে ধরে রাখবার প্রবণতা চোখে পড়ে। অবশ্য বলে নেওয়া ভালো যে, এখন আমরা যে বস্তুটিকে সিনেমা বলে জানি, আদিযুগের শুতে তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তখন এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘটনা নিয়ে তৈরি দৃশ্যকে পরপর দেখানো হত একটি প্রদর্শনীর মধ্যে। ঘটনাগুলোও ছিল পরস্পর সম্বন্ধহীন। এক-একটি ঘটনা এক-একটি ছবির বিষয়। এর ফলে পর্দার বুকে দৃশ্যপটে স্বভাবতই একটা তথ্যের বাহুল্য তৈরি হত। মধ্যযুগের চিত্রকলায় যেভাবে দর্শকের চোখ দৃশ্যপটের নানা উপাদানের ওপর আস্তে-আস্তে প্রসারিত হত, আদি চলচ্চিত্রের দৃশ্যপটকেও ঠিক সেভাবে দেখতে হত, অনুধাবন করতে হত। এই যুগের একেবারে প্রথম পর্যায়ের একটি ছবিকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। ১৮৯৭ সালে এডিসন বায়োস্কোপ কোম্পানী তৈরি করেছিলেন 'ফ্রেড অটোজ স্নিজ'। একটি মাত্র দৃশ্যের মধ্যে ফ্রেড অটোর শারীরিক অস্বস্তি এবং শেষ পর্যন্ত তার হেঁচে ফেলার পুরো কর্মকান্ডটা ধরা ছিল। তখন অবশ্য ছবি-তৈরির একটা সহজ হিসেব ছিল। ফিল্মের একটি রীল শেষ হতে যতটা সময় লাগে, একটি দৃশ্যের স্থায়িত্বও হত ততটাই। ক্যামেরাকে ব্যবহার করা হত একজন নিরপেক্ষ দর্শকের প্রতিভু হিসেবে। এই দর্শক সামনে দাঁড়িয়ে খুব নিরাসক্তভাবে যেন দৃশ্যটিকে প্রত্যক্ষ করে নিজের অবস্থানে অনড় থেকে। প্রয়োজনমতো একটু কেবল চোখটা ঘোরায় দেখার সুবিধে হবে বলে। আদিযুগের একেবারে শেষ পর্যায়ে এই এডিসন বায়োস্কোপ কোম্পানীই যখন তৈরি করলেন 'দ্য লাইফ অব অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন' নামের সিনেমা (১৯১৫), তখনো লিঙ্কনের জীবনের বিখ্যাত ঘটনাগুলিকে সময়ানুক্রমিক ধারাবাহিকতায় এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দৃশ্যে রূপায়িত করা হচ্ছিল। এগুলি যেন এক-একটি অধ্যায়। তারপর এই 'অধ্যায়' গুলি ইন্টারটাইট্‌ল সহযোগে পরপর সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আদিযুগের সিনেমায় স্বয়ংসম্পূর্ণ দৃশ্যের এই যে ঐতিহ্যটি তৈরি হয়েছিল, তাকে আধুনিকযুগের ঐতিহাসিকেরা বলছেন 'ট্যাবলো দৃশ্যের ঐতিহ্য'। কাকে বলা হয় 'ট্যাবলো দৃশ্য'? আধুনিক ইতিহাসিকেরা বলছেন 'ট্যাবলো দৃশ্যের ঐতিহ্য'। কাকে বলা হয় 'ট্যাবলো দৃশ্য'? আধুনিক ইতিহাসবেত্তারা লক্ষ্য করেছেন, এ ধরনের উপস্থাপনায় দৃশ্যের একেবারে সামনে ক্যামেরাকে দাঁড় করিয়ে ছবি তোলা হত এবং একবার যেখানে ক্যামেরাকে দাঁড় করানো হত, দৃশ্যটি শেষ হওয়ার আগে সাধারণত ক্যামেরাকে সেখান থেকে নড়ানো হতনা। চরিত্রগুলি অবশ্য স্থাণু হয়ে থাকত না। তবে তাদের নড়াচড়াও হত ক্যামেরার সমান্তরাল অবস্থানে — হয় ফ্রেমের বাঁদিক থেকে ডানদিকে, অথবা ডাইনে থেকে বাঁয়ে। চরিত্ররা ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসছে বা ক্যামেরা থেকে দুরে চলে যাচ্ছে, এমন ভাবনা তখন দূরস্থান। অবশ্য এসব করার অসুবিধেও ছিল তখন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছবি তোলা হত একটি আলোকিত ঘরের মধ্যে। সে ঘরের আয়তনও খুব বেশি হত না। দৃশ্যের ভৌগোলিক বা স্থানিক চরিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা হত থিয়েটারের মতো প্রেক্ষাপট বা ব্যাকড্রপ। দৃশ্যের মধ্যে সমপরিমাণ আলো ফেলা হত ওপর থেকে, একটা ছোট্ট অঞ্চলে। ফলে অভিনয় বা নড়াচড়ার ক্ষেত্রটি ছিল সীমিত। দৃশ্য রচনার মূল দ্রষ্টব্যটিকে রাখা হত ফ্রেমের মাঝামাঝি জায়গায়। এমনকি অভিনেতারাও তাঁদের মূল কাজগুলো করার সময় একটি মধ্যবর্তী বা কেন্দ্রীয় অবস্থানে চলে আসতেন; কাজ শেষ হলে সরে যেতেন পাশে অথবা একেবারে বেরিয়েই যেতেন ফ্রেম থেকে। এসব ট্যাবলো-দৃশ্যের মধ্যে আলো আঁধারির তারতম্য ব্যবহার করে তৈরি করা হত না কোনো গভীরতা, ফ্রেমের পুরোভাগ-পশ্চাদ্ভাগের ব্যবধানের সাহায্যে তৈরি করা হত না দূরত্বের কোনো তৃতীয় মাত্রা।

দ্বিমাত্রিক দৃশ্য সংগঠনের এই সরল পদ্ধতি তখনকার সিনেমার পক্ষে ছিল মানানসই। কারণ সেই সিনেমার ওপর তখনো চেপে বসেনি আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত নিটোল এক আখ্যান তৈরির দায়। বাস্তবের অনুকৃতি বা আকর্ষণীয় দৃশ্যরচনার ত

াগিদই আদিসিনেমার প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি ঘটনার তাৎক্ষণিক তাৎপর্য বা ক্ষণস্থায়ী আবেদনে সীমাবদ্ধ ছিল আদি চলচ্চিত্রকারদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আদি সিনেমার দর্শকরাও চাইতেন নিছক দৃষ্টিসুখের উল্লাস। তখনকার ছবি নিশ্চয়ই দর্শকদের আলোড়িত করেছে। তবে সে আলোড়ন ছিল সাময়িক। দর্শকের বোধ, অনুভুতি আর কল্পনার গভীরে পৌঁছে ত াদের সংবেদনকে প্রভাবিত করার মতো উপাদান সেই সিনেমায় ছিল না।

অনাস্বাদিত সেই গভীরতা সিনেমার পর্দায় নিয়ে আসার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন পরবর্তী যুগের চলচ্চিত্রকারেরা। অন্ধকার ঘরে স্বল্পস্থায়ী আয়োজনের যে সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল আদিযুগের সিনেমা, সেটিকে তাঁরা ধীরে ধীরে আরো প্রসারিত করলেন,কারো একার চেষ্টায় নয়, সম্মিলিত প্রয়াসে। তাঁদের উৎসাহের প্রাথমিক পর্যায়ে সিনেমায় এল থিয়েট ারের আদল। অভিনীত নাটকের ঢং-এ বিন্যস্ত হল দৃশ্যের সমবায়। সিনেমায় আখ্যানের অনপ্রবেশ হল। তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চলচ্চিত্রকারেরা উপলব্ধি করলেন, স্থান, কাল আর দৃশ্য উপাদানের যে আপেক্ষিক সীমায় থিয়েটার বাঁধা পড়ে যায়, কথা সাহিত্যভিত্তিক সিনেমা তার থেকে মুক্তির একটা উপায় হতে পারে যদি ঠিকমতো সংগঠিত করা যায় সিনেমার দৃশ্যগত উপাদান।

কথা সাহিত্যের চাপে সিনেমায় দৃশ্য সংগঠনের ধরনটা আমূল বদলে গেল। আদি সিনেমার আকর ছিল একটি ঘটনা বা ত্রিয়াকে ন্দ্রিক দীর্ঘায়িত শট। সে যুগের ছবিতে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের শট ও খুব অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। কিন্তু সা হিত্য-নির্ভর সিনেমার নতুন ধারার সন্ধানীরা তাঁদের ছবিতে শটের গড়পড়তা স্থায়িত্বকে অনেক কমিয়ে আনলেন। 'দ্য ল াইফ অব অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন' যে -বছর তৈরি হয়েছিল, তার ঠিক এক বছর আগে তৈরি হয়েছিল 'দ্য বার্থ অব আ নেশন' নামে একটি ছবি। সিনেমার ইতিহাসে এ-ছবিটিকে চিহ্নিত করা হয় প্রথম ধ্রুপদী ছবি হিসাবে। প্রায় সমসাময়িক এই দুটি ছবির মধ্যে দৃশ্য রূপায়নের পদ্ধতিতে পাওয়া যাবে এক দুস্তর ব্যবধানের স্বাক্ষর। প্রথম ছবির মতো দ্বিতীয় ছবিতেও রূপা য়িত হয়েছে লিঙ্কনের হত্যাদৃশ্য। কিন্তু এখানে এই দৃশ্যের মধ্যে আছে মোট ঊনচল্লিশটি শট। এই শটগুলিতে রূপায়িত হচ্ছে হত্যার অকুস্থল থিয়েটারটির বিভিন্ন জায়গায় দৃশ্য। লিঙ্কন ও তাঁর সঙ্গীদের আচরণ, লিঙ্কনের দেহরক্ষীর কাজকর্ম, লিঙ্কনের হত্যাকারীর প্রস্তুতি, ছবির দুটি মূল চরিত্র, বেন ও এলসি-র অভিব্যক্তি, নাটকের দর্শক ও নাটকের কুশীলবদের ত্রিয়াকলাপ। আকরগুলি নিঃসন্দেহে ত্রিয়াসূচক। কিন্তু কোনো একটি ত্রিয়াকেও স্বয়ংসম্পূর্ণ দৃশ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি।বরং ছোট-ছোট শটের বিন্যাসে বোনা হয়েছে, দৃশ্যমালার এক নিপুণ নক্সা। এভাবেই অর্থবাহী করে তোলা হয়েছে সমগ্র ঘটনাটিকে। প্রসঙ্গত বলে নেওয়া যায়, 'দ্য বার্থ অব আ নেশন' হল সওয়া দু'ঘন্টার ছবি। আর এ-ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে ন'হাজার ন'শোটি শট। এই তথ্যটি সিনেমায় দৃশ্যরচনা বা দৃশ্যব্যবহারের এক নতুন পদ্ধতির ইঙ্গিত দেয়। দর্শকের চাহিদাও বদলাচ্ছে এই সময় ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে। নিছক দৃশ্যের মায়ায় মোহিত হতে চাইছেন না তাঁরা। দৃশ্যের মধ্যে তাঁরা খুঁজছেন ভাব।

রূপের মাধুরী

নতুন পদ্ধতির যাঁরা ধারক, তাঁদের উপলব্ধি, পর্দায় ঘটনার প্রতিরূপ যদি হতে চায় ভাবেরও বাহন, তাহলে প্রয়োজন নির্ব াচনের। একটি ঘটনা বা একটি ত্রিয়ারও সবটুকু দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় না-ই হতে পারে। ফলে এখন থেকে চলচ্চিত্রক ারেরা বেছে নিতেন, বা বলা ভালো তৈরি করতেন, প্রতিনিধিত্বমূলক কয়েকটি টুকরো দৃশ্য। এরকম প্রতিটি টুকরোই নির্মিত হত প্রভূত যত্নসহকারে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে ঘটনা বা ত্রিয়ার অসম্পূর্ণ রূপায়ণ সত্ত্বেও সেসবের তাৎপর্য বুঝে নিতে দর্শকের খুব অসুবিধে হত না। বিভিন্ন প্রতিনিধিমূলক অংশের সমাহারে প্রতিটি দৃশ্যেই তৈরি হত কিছু ব্যঞ্জনা। দৃশ্যগুলো যাতে নিছক সাংবাদিকের বর্ণনা হয়ে না যায়, সেদিকে লক্ষ রাখতেন চলচ্চিত্রকার। ব্যঞ্জনাময় বিভিন্ন মাপের, বিভিন্ন ভাবের দৃশ্য সাজিয়ে তঁ ারা নিজেদের উপস্থাপনায় শুধু গতিই আনলেন না, তাতে যোগ করলেন ছন্দ। দৃশ্য বিন্য াসের এই ভঙ্গি থেকে ত্রমে জন্ম নিল আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত একটি সম্পূর্ণ আখ্যান। এই আখ্যান তৈরি হয়ে উঠত তার নিজস্ব যুক্তিতে। সময়ানুত্রমিক কাহিনী বা chronicle.-এর সীমাবদ্ধতা তাতে নেই। এই আখ্যানে অহরহ কাজ করে স্থান, কাল অ ার পাত্রের সজীবতা বা পরিবর্তনশীলতা। স্থান থেকে স্থানান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে, পাত্র থেকে পাত্রান্তরে যাওয়ার অবাধ স্বাধীনতা সেখানে। এই স্বাধীনতা আখ্যানভিত্তিক সিনেমা অর্জন করেছে মূলত দৃশ্যেরই হাত ধরে। শট বিভাজনের

কৌশল চলচ্চিত্রকারদের আয়ত্তে এসে যাওয়ার বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই সিনেমার জগতে ব্রাত্য হতে থাকে ট্যাবলো-ধর্মী দৃশ্যের দ্বিমাত্রিকতা। ১৯২০-র দশক থেকে ক্যামেরা আর নিছক দৃশ্যধারণের উপকরণ হয়ে রইল না, হয়ে উঠল দৃশ্যগঠনের সক্রিয় সহযোগী। সিনেমার আদি পরিকল্পকে বর্জন করে যে নতুন পরিকল্প তৈরি করা হল এই সময় থেকে, ক্যামেরার সক্রিয়তা হয়ে দাঁড়াল তার পরিপূরক।

সিনেমার এই নতু ন উপস্থাপন পদ্ধতিতে ক্যামেরা ব্যবহারের প্রাথমিক শর্তই হল, বক্তব্যের প্রয়োজনে যেটুকু অপরিহার্য তা স্পষ্ট দেখানো, গৌণ প্রসঙ্গগুলো শুধু ছুঁয়ে যাওয়া আর অদরকারি ব্যাপারগুলোকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া। কথাগুলো শুনতে সহজ। কিন্তু একটা ছবিতে মূলত দৃশ্যের মাধ্যমে সারাক্ষণ এই ব্যাপারটা বজায় রাখতে হলে ক্যামেরার কাজে থাকা চাই নানা মাত্রা আর বৈচিত্র্য। যে সিনেমাকে আজ আমরা চিনি, তার প্রাণরস হল ক্যামেরার বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি।

ক্যামেরার প্রধান গুণ, সজীব দৃশ্যের অবিকল প্রতিরূপ গ্রহণের ক্ষমতা। শুধু তাই নয়, একাজে কখনো বা সে নিজে সচল হয়ে ঘটনাকে অনুসরণ করে, আবার কখনো স্থির অবস্থায় লক্ষ করে সবকিছু। ঘটনাপ্রবাহ এবং ক্যামেরার সচলতা, এই দুইয়ের সংমিশ্রনেই গড়ে ওঠে সিনেমার দৃশ্য। তবে ক্যামেরাকে যেভাবেই ব্যবহার করা হোক, তা করা হয় খুব সন্তর্পণে, দর্শকের বোধকে অহেতুক পীড়া না দিয়ে এবং ক্যামেরার ভূমিকাটিকেও যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রেখে। অবশ্য লক্ষ রাখতে হবে, শেষের এই কাজটি করতে গিয়ে যেন দর্শকের মনোযোগ শিথিল হয়ে না পড়ে অথবা কল্পনার গতি যেন বাধা না পায়। ক্যামেরার বিশেষ কোনো কাজই কখনো- কখনো এ ব্যাপারে দর্শককে সাহায্য করতে পারে। তখন তাকে উপেক্ষা করা মোটেই উচিত নয়।

সিনেমায় গতিশীল ক্যামেরা ব্যবহারের অবাধ সুযোগ আছে বলেই যে পর্দায় প্রতিফলিত দৃশ্যেও সবসময় একটা গতির ভাব থাকতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। নির্দিষ্ট কোনো অবস্থানে স্থির থেকেই ক্যামেরা একটি সজীব দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত চরিত্র এবং বস্তুগুলির আকার, আয়তন, ঘনত্ব, অবস্থান ক্যামেরার সাপেক্ষে যেমন, তেমনি পরস্পরের সাপেক্ষেও, তাদের গতি, জড়তা, তাদের ওপর আলো-ছায়া- অন্ধকারের খেলা, এসবই যদি খুব ভেবেচিন্তে ব্যবহার করা যায়, তাহলে অনেক সময়েই ক্যামেরা নড়ানোর কোনো দরকার হয় না।

সাধারণত কোনো বিশেষ ব্যাপারে দর্শককে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট রাখতেই এভাবে ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। ধরা যাক, কোনো দৃশ্যে একটি চরিত্রকে নড়েচড়ে কিছু একটা করতে দেখা যাচ্ছে। তার কাজটাই যদি বেশি গুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে ক্যামেরা সেই কাজ -কেই স্পষ্ট করে, জোর দিয়ে দেখাবে। কাজ করতে করতে চরিত্রটি কী ভাবছে বা বলছে, তা-ই যদি বেশি জরি হয় তাহলে একটা মাঝামাঝি দূরত্বে থেকে ক্যামেরা তার পুরো নড়াচড়াকে ধরবে দৃশ্যের সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ জায়গায়, সাধারণত পর্দার মাঝখানে। কিন্তু যদি তার মুখের ভাবটাই মুখ্য হয়, তাহলে ক্যামেরা ওই মুখকেই ধরবে খুব কাছে গিয়ে। দৃশ্যবস্তু থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে ক্যামেরার অবস্থান (ক্যামেরা-দূরত্ব) আর তার দেখানোর ভঙ্গি (দৃষ্টিকোণ) থেকেই এখানে দৃশ্যের মানেটা বেরিয়ে আসছে।

খুব বেশিক্ষণ ক্যামেরা নিশ্চল রাখলে অবশ্য সিনেমার গতি নষ্ট হতে বাধ্য। পরবর্তী বিষয়টি জানবার জন্যে ততক্ষণে দর্শকের মনে তৈরি হয়ে গেছে চাহিদা। সেই চাহিদা পূরণ করার জন্য গতির ব্যবহার অনিবার্য।

সিনেমায় দুভাবে গতি আনা যায়-ক্যামেরার স্বাভাবিক গতিশীলতাকে কাজে লাগিয়ে অথবা কৃত্রিম গতির অনুভুতি তৈরি করে। কোনো ঘটনার পুরোটা না-দেখিয়ে গুত্বপূর্ণ অংশগুলো দেখালেই যদি বক্তব্য পরিষ্কার হবে বলে মনে হয়, তাহলে বিভিন্ন ক্যামেরা-দূরত্ব আর দৃষ্টিকোণকে কাজে লাগিয়ে একাধিক আকস্মিক ছেদের (cut) সাহায্যে শট-বিভাজন করে, এবং তারপর সেই টুকরো অংশগুলো জোড়া দিয়েই এক কৃত্রিম গতি তৈরি করা যায়। তবে এক্ষেত্রে সম্পাদনারও একটা ভূমিকা আছে। আবার বিভিন্ন শটের বহু দরকারি খুঁটিনাটি তুলে ধরতে ক্যামেরার নিজস্ব গতিকে কাজে লাগাতেই হয়। আর যখন একটা ঘটনার প্রতিটি মুহূর্তই সিনেমার প্রয়োজনে জরী হয়ে দেখা দেয়, তখন তো এই ক্যামেরা গতির বিরাট ভূমিকা!

চলচ্চিত্রের ক্যামেরা নানাভাবে সচল হতে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই সচলতার আলাদা-আলাদা তাৎপর্য। যখন কোনো বিশেষ চরিত্রের শারীরিক গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একই তালে বা একই লয়ে ক্যামেরা চলাফেরা করে, তখন বোঝা দরকার সেই চরিত্রটিই দৃশ্যের মূল আকর্ষণ। পারিপার্শ্বের ভূমিকা সেখানে গৌণ। হয় কোনো সচল বস্তুর ওপর ক্যামেরা

রেখে (ট্র্যাক, প্ল্যাটফর্ম, ডলি বা ক্রেন) অথবা ক্যামেরাম্যানকে, হাতে ক্যামেরা ধরা অবস্থায়/কাঁধে রেখে, নিজে সচল হয়ে এই কাজটা করতে হয়। আবার একই জায়গায় স্থির রেখে ক্যামেরার মুখকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওপরে নিচে নড়িয়েই একটা পুরো কাজকে ফ্রেমের মধ্যে ধরে রাখা যায় যাতে সেই কাজটিরস্বচ্ছন্দ গতি অব্যাহত থাকে। এসব কাজের আছে নানা পে াশাকি নাম। একই অনুভূমিক অক্ষে ডাইনে বাঁয়ে ক্যামেরার মুখ ঘোরানোকেবলে প্যানিং; আর একটি কল্পিত উল্লম্ব অক্ষ ধরে ওপর-নিচে ক্যামেরার মুখ ঘোরানোর নাম টিল্ট। কোনো বিশেষ ভাব প্রকাশের জন্যেও এভাবে ক্যামেরা চালানো য ায়। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিতে (১৯৭০) নিজের বোনের অফিসের বড় সাহেবের বাড়িতে, সাহেবের মুখোমুখি বসে সিদ্ধার্থ মন দিয়ে লক্ষ করে তাঁর সাজ-পোষাক, হাবভাব। প্রায় মিনিট খানেক শুধু ক্যামেরা নড়িয়ে সত্যজিৎ রায় এই দৃশ্যটিকে সা জিয়েছেন অসাধারণ দক্ষতায়।

এমনও হতে পারে, চরিত্রটি মোটামুটি স্থির হয়ে আছে বা খুবই সামান্য নড়াচড়া করছে, আর ক্যামেরা আস্তে-আস্তে তার দিকে এগিয়ে যাওয়া বা দূরে সরে আসার মধ্যেও চরিত্রটি যদি মুখ্যস্থানেই থাকে, তাহলে বুঝতে হবে চরিত্রটিকে লক্ষণীয় করে তোলাই পরিচালকের অভিপ্রেত। ক্যামেরাকে চরিত্রের কাছে নিয়ে যাওয়ার অর্থ চরিত্রের হাবভাব, মুখভঙ্গি স্পষ্ট করে তোলা। আর দুরে সরিয়ে আনার অর্থ তার মনোভাবের সঙ্গে তার শারীরিক ক্রিয়ার একটা যোগসূত্র প্রকাশ করা। কাহিনীর নাটকীয়তা বজায় রাখতে,উত্তেজনা বাড়াতে ক্যামেরার এইসব ব্যবহার। তবে ক্যামেরা দুরে সরিয়ে আনার অন্য একটা মানেও হয়, দৃশ্যের গুত্ব আস্তে আস্তেকমিয়ে দেওয়া। নির্ভর করছে পরিস্থিতির ওপর। পোশাকি ভাষায় ক্যামেরার এরকম চলনকে বলে ট্র্যাকিং। দৃশ্যের মধ্যে কোনো সচল বস্তু বা চরিত্রকে অনুসরণ করার কাজেও ব্যবহৃত হয় এই ধরনের ট্র্যাকিং।

ক্যামেরা-দুরত্ব বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য দৃষ্টিকোণও পাল্ট াতে পারে। ক্যামেরা নড়ানোর ফলে কোনো কর্মরত চরিত্র যদি আস্তে-আস্তে দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, সেক্ষেত্রে দর্শকের মনোযোগকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যাওয়াই পরিচালকের উদ্দেশ্য বলে বুঝতে হবে।

অনেক সময়েই আবার কোনো বিশেষ চরিত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে নিজস্ব একটা গতি ও ভঙ্গিতে ক্যামেরা সচল হয়। মাঝে মাঝেই হয়তো একটি চরিত্রকে ধরে কয়েক মুহূর্তের জন্য, আবার সরে যায় অন্য চরিত্রে। এরকম সরে- যাওয়া হতে পারে এক বস্তু থেকে অন্য এক বস্তুতেও। আসলে এই অবস্থায় ক্যামেরার সাহায্যে একটি ঘটনার পুরো ছকটাকেই ফুটিয়ে তোল া চলচ্চিত্রকারের লক্ষ্য একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সেই মুহূর্তগুলোয় দৃশ্য-অন্তর্গত এক-একটি উপাদানের ভূমিকা হয়ে যায় গৌণ।

এই দৃষ্টিকোণের প্রসঙ্গেই আসে ক্যামেরার দৃষ্টিতল বা দৃষ্টিরেখারও কথা। ক্যামেরার সাহায্যে একটি দৃশ্যকে উপস্থাপন করার জন্যে গড়পড়তা উচ্চতার একজন মানুষের দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় চোখের যে উচ্চতা তাকেই নিরিখ হিসেবে ধরা হয়। একটি সিনেমায় অধিকাংশ দৃশ্যই নির্মিত হয় এই দৃষ্টিরেখার ভিত্তিতে। এর নাম আই লেভেল শট। তবে অনেক সময় এই 'স্বাভাবিক' দৃষ্টিরেখার অনেকটা নিচে ক্যামেরা বসিয়ে লেন্সের মুখ ওপরদিকে করে কোনো বস্তু বা চরিত্রে আরোপ করা হয় একটা অস্বাভাবিক বিশালত্ব ভয়াবহতার ব্যঞ্জনা আনতে। পোশাকি ভাষায় এর নাম লো অ্যাঙ্গেল শট। আবার অনেক উঁচু থেকে বিশাল এক পট -ভুমির সাপেক্ষে সেই একই বস্তু বা চরিত্রে আরোপ করা যায় ক্ষুদ্রতা তখন সেখানে অসহায়ত্বের ব্যঞ্জনা। এর নাম হাই অ্যাঙ্গেল শট।

ক্যামেরার কাজে অবশ্য দৃষ্টিতলের বৈচিত্র্যের চেয়েও বেশি গুত্ব পায় বা বলা ভালো বেশি ব্যবহৃত হয়, ক্যামেরা অবস্থ ানের বৈচিত্র্য। একটি দৃশ্যের কতটুকু দর্শকের চোখের সামনে আসবে, তা মূলত নির্ভর করে ক্যামেরার অবস্থানের ওপর। ক্যামেরাকে যদি দৃশ্য বা দ্রষ্টব্যের খুব কাছে বসানো হয়, তাহলে ফ্রেমের মধ্যে ধরা থাকবে দৃশ্যের (বা দ্রষ্টব্যের) খুবই সীমিত একটি অংশ। একেআমরা বলি ক্লোজ আপ। ক্যামেরাকে যদি বসানো হয় মাঝামাঝি একটা দুরত্বে, দৃশ্যের খুব দুরেও নয়, খুব কাছেও নয় তাহলে সেই দৃশ্যের অনেকটাই দর্শকের দৃষ্টিগোচর হবে। এর নাম মিড শট। আর ক্যামেরাকে যদি বসানো হয় দৃশ্যের থেকে বেশ দুরে, তাহলে একটা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে দর্শকের চোখের সামনে এনে ফেলা যায়। একে অ ামরা জানি লং শট বলে। একজন মানুষের নিরিখে যদি বিষয়টিকে বুঝতে চাই, তাহলে বলতে হয় ক্লোজ আপ-এ ধরা পড়বে শুধু মানুষের মুখটুকু, মিড শটে মুখ আর বুক এবং লং শটে পুরো শরীর। এটাকে অবশ্য নিছক উদাহরণ হিসেবে

মনে রাখাই ভালো। আর, একথাও মনে রাখা ভালো যে সত্যি- কার দৃশ্য নির্মাণে ঘটানো যায় এর অসংখ্য হেরফের। নির্ভর করবে, কী দেখানো হবে, কেন দেখানো হবে, তার ওপর।

কী দেখানো হবে, এ ব্যাপারে লেন্সের আছে এক গুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একটি দৃশ্যের কতখানি অংশ ক্যামেরা ধরে রাখবে, তা স্থির করে দেয় লেন্স। এর ফলে দর্শকের দৃষ্টির বিস্তারকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দৃষ্টির বিস্তার বা অ্যাঙ্গেল অব ভিশনকে ম াপা হয় কোণের নিরিখে। সাধারণভাবে মানুষের দৃষ্টির বিস্তার৫০°কোণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ একজন মানুষ যখন সোজা সামনেরদিকে তাকিয়ে থাকে, তখনো ডাইনে-বাঁয়ে আরো কিছুটা অঞ্চল তার দৃষ্টিগোচর হয়। এই পুরো অঞ্চলটার কৌণিক মান হল ৫০°। ক্যামেরার লেন্স দিয়েও এই রকম একটা দৃষ্টিক্ষেত্র তৈরি করারই চেষ্টা হয়, অধিকাংশ দৃশ্যে। এর জন্যে ব্যবহার করতে হয় নর্ম্যাল লেন্স। নর্ম্যাল লেন্সের দৃষ্টিক্ষেত্র মোটামুটি ৪৬°। কিন্তু কখনো কখনো সিনেম ার দৃশ্যের মধ্যে ধরা হয় আরো বিস্তৃত একটি ক্ষেত্র। খালি চোখে, শুধু একদিকে তাকিয়ে, দৃষ্টির এতখানি বিস্তার অর্জন করা সম্ভব নয়। একাজটা করতে পারে ক্যামেরার জন্যে তৈরিবিশেষ এক ধরনের লেন্স-- ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স। এরকম লেন্স ব্যবহার করে দৃশ্যের বিস্তারকে প্রায় ৭৫°-তে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। এমন লেন্সও এমনকি আছে, যা ধরে রাখতে প ারে ১৮০° কোণের একটি দৃষ্টিক্ষেত্র। এর নাম ফিশ আই লেন্স। মাছ বা পোকামাকড়ের দৃষ্টিকে অনুকরণ করতে পারে এই লেন্স-- নামেই তার প্রমাণ। আবার, দৃষ্টিক্ষেত্রকে খুব সংক্ষিপ্ত করে দৃশ্যবস্তুকে দর্শকের কাছাকাছি নিয়ে আসারও উপায় থাকে বিশেষ এক ধরণের লেন্স-এ-- টেলিফটো লেন্স। দূরবর্তী কোনো বস্তুর কাছে পৌঁছে যাওয়ার অনুভূ তি তৈরি হয় দর্শকের মনে, এরকম লেন্স ব্যবহারের ফলে।

লেন্স ব্যবহারের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে দৃষ্টিকোণের গভীরতা বা ডেপথ্ অব ফিল্ড-এর প্রসঙ্গ। একটি দৃশ্যে আমরা যা দেখি, তার সবই অপরিহার্য বলেই আমাদের দেখানো হয়। সাধারণত তাই দৃশ্যের প্রতিটি অংশই মোটামুটি সমান স্পষ্ট থাকে অর্থাৎ ফোকাস-এ থাকে। এরকম দৃশ্যে আমরা যা দেখি, তার সবই অপরিহার্য বলেই আমাদের দেখানো হয়। সাধ ারণত তাই দৃশ্যে পুরোভাগ এবং পশ্চাদ্ভাগের মধ্যে ব্যবধান থাকে সামান্যই। অন্যভাবে একথাও বলা যায় যে, এরকম দৃশ্যের মধ্যে গভীরতা কম। কিন্তুযদি এমন অবস্থা আসে যে, কোনো একটি বিশেষ দৃশ্যকে অপরিবর্তিত রেখেই বিভিন্ন মুহূর্তে তার পুরোভাগ এবং পশ্চাদ্ভাগের এক-একটি অঞ্চলকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে ফোকাস-এর ত ারতম্য ঘটিয়ে কাজটা করতে হবে। জরি অংশটি তখন স্পষ্ট ফুটে ওঠে (sharp focus), আর দৃশ্যের অন্যান্য অংশ ঝ াপ্সা হয়ে যায় (out of focus.)। আজকাল অনেক ছবিতেই লক্ষ করলে ব্যাপারটা

ঘটতে দেখা যায়। এর সাহায্যে দৃশ্যক্ষেত্রের গভীরতাটিকেও দর্শকের সামনে তুলে ধরা যায়।

দৃশ্যনির্মাণ, আর সে কাজে ক্যামেরার ভূমিকা নিয়ে যে সব মোটাদাগের কথা ওপরে বলা হল, তাতে ক্রমশ একথা নিশ্চ য়ইপরিষ্কার হয়ে গেছে যে সিনেমায় যেসব দৃশ্য আমরা দেখি সেসব আমাদের চোখে দেখা দৃশ্যের তুলনায় অনেকখানি আলাদা। চোখে যখন কোনো দৃশ্য আমরা দেখি, তখন সেই দেখার দায় পুরোপুরি আমাদের। সেই দৃশ্যের তাৎপর্য অনুধাবন করারও দায় আমাদেরই কিন্তুসিনেমায় যেসব দৃশ্য আমরা দেখি, তার পেছনে কাজ করে চলচ্চিত্রকারের দায়। দৃশ্যের মাধ্যমে চলচ্চিত্রকার নিয়ন্ত্রণ, বা বলা উচিত, প্রভাবিত, করেন দর্শকের মনকে। ফলে সিনেমার দৃশ্যের মধ্যে অনেকসময়েই থাকে না দৈনন্দিন বা আটপৌরে দৃশ্যের স্বাভাবিকতা বা বাস্তবতা।

অনেক সময়েই দেখা যায় যে সিনেমার পর্দায় ঘটনা ঘটছে একটা অস্বাভাবিক লয়ে, হয় খুব জোরে (slow Motion)

না হয় খুব আস্তে (slowMotion)। চ্যাপলিন তাঁর বিভিন্ন ছবিতেই একটা অস্বাভাবিক দ্রুত লয় তৈরি করে হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। আর, দেশি, বিদেশি বহু ছবিতেই স্বপ্ন বা কল্পনার দৃশ্যে আমরা দেখেছি অতি বিলম্বিত লয়ের ব্যবহ ার।

এমনকি বিশেষ বিশেষ লেন্স বা ফিল্টার (যা দিয়ে লেন্সের মধ্যে দিয়ে ফিল্মের ওপর পড়া আলো বা রঙের গুণাগুণে হের-ফের ঘটানো হয়) ব্যবহারে দৃশ্যের স্বাভাবিকতা নষ্ট করে দিয়েও অসাধারণ কোনো মেজাজ তৈরি করতে দেখা গেছে চলচ্চিত্রকারকে'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবিতে (১৯৫৯) ঋত্বিক ঘটক প্রায় আগাগোড়াই ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স ব্যবহার করে বস্তুজগৎ আর মনো-জগতের বৈপরীত্যকে ফোটাতে চেয়েছেন। সরল শিশুমনে জটিল নাগরিক সভ্যতার প্রতিক্রিয় াকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করতেই চলচ্চিত্র- কারের এই প্রয়াস। সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' ছবিতে (১৯৭৮) নবাব ওয়া

জিদ আলি শাহ যখন লখন্উ ছাড়তে হবে এই সম্ভাবনায় বিষণ্ণ, তখন পুরো দৃশ্যটায় একটা লাল আভা ছড়িয়ে পড়ে। এই দৃশ্যের চিত্রায়ণে লালরঙ্গের ফিল্টার ব্যবহার করে সত্যজিৎ রায় একটি বেদনাবিধুর পরিবেশের আবেদনকে আরো গাঢ় করে তুলেছেন।

তবে এগুলো হল ব্যতিত্রম বা বিশিষ্ট প্রয়োগের কথা। সাধারণভাবে ক্যামেরার কাজে অবস্থান বা দুরত্ব, গতি আর লেন্সের ভূমিকাই বিশেষ গুত্বপূর্ণ। এদের সমন্বয়ে সিনেমার দৃশ্য হয়ে ওঠে কাহিনী বা বিষয়ের সঙ্গে সুসমঞ্জস এবং দর্শকের পক্ষে আর্কষণীয়

কিন্তু সামগ্রিকভাবে সিনেমার দৃশ্যনির্মাণে ক্যামেরার ভূমিকা কী? কীভাবে সে উপস্থাপন করবে দৃশ্যকে? সাধারণত এই ভুমিকা নিরপেক্ষ এক সর্বদ্রষ্টা উপস্থাপকের মহাভারতের সঞ্জয়ের মতো। তার দৃষ্টিতে নেই কোনো সীমাবদ্ধতা। বিভিন্ন সময়ে সে বেছে নেয় বর্ণনার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত দৃষ্টিকোণ। একমাত্র শর্ত ঘটনাকে যথাসম্ভব স্পষ্ট এবং যুক্তি-সঙ্গত উপায়ে দেখানো, তার সমস্ত প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি তুলে ধরা।

অনেক সময়েই কিন্তু ক্যামেরা একটিমাত্র বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই কাহিনীর বর্ণনা দেয়। যেন নিজেই সে সংশ্লিষ্ট কোনো চরিত্র। কাহিনীর সামগ্রিক বিস্তার নয়, স্থান, কাল আর কার্য পরম্পরার একটা বিশেষ ছক তৈরি করাই তার লক্ষ্য। সে তখন বেছে নেয় শুধু সেই ছকের সঙ্গে মানানসই দৃশ্যগুলোকে। জাপানি পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়ার বিখ্যাত ছবি 'রশোমন'-এ (১৯৫০) দেখা গেছে এই পদ্ধতির অসাধারণ প্রয়োগ। একই ঘটনায় জড়িত তিনজন ব্যক্তির চোখে সেই ঘটনার যে- তিনটি বিভিন্ন রূপ ধরা পড়েছে, তাকেই কুরোসাওয়া ফুটিয়ে তুলেছেন মূলত ক্যামেরা- ব্যবহারের অভিনবত্বে।

তবে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কখনোই ক্যামেরাকে পুরোপুরি অন্তরঙ্গ বা পুরোপুরি নিরপেক্ষ ভাবে ব্যবহার করা হয় না। বক্তব্যের প্রয়োজনে, আর স্বাচ্ছন্দ্যের খাতিরে, এ-দুয়ের এক সুষ্ঠু সমন্বয়েই গড়ে ওঠে সিনেমা।

অবশ্য ক্যামেরার সাহায্যে দৃশ্যগুলি নির্মাণ করলেই সিনেমার কাজ শেষ হয়ে যায় না। দরকার বিন্যাসের। দৃশ্যগুলো তে লাহয়ে গেলে যুক্তিগ্রাহ্য একটা ধারাবাহিকতায় সেগুলোকে জুড়ে দিতে হয়। আমরা জানি, একে বলে সম্পাদনা। তবে কেবল ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য বা কতগুলো দৃশ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ জুড়ে দেওয়াই সম্পাদনা নয়। সম্পাদনা আসলে এমন এক পদ্ধতি যা দর্শককে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে প্রভাবিত করে। একাজে ব্যবহার করা হয় কিছু কৌশল। এর কয়েকটি প্রযুক্তি ভিত্তিক। যেমন— কাট্, ফেড্, ডিজল্ভ্ বা ওয়াইপ্। কাট্ হল নিমেষে দৃশ্যান্তরে যাওয়া— এর ফলে তৈরি করা হয় নিরবচ্ছিন্নতা। কিন্তু যদি দৃশ্যান্তরে যাওয়ার জন্যে ব্যবহার করা হয় তুলনামূলকভাবে ধীরলয়ের কোনো পদ্ধতি (যেমন, ফেড্ , ডিজল্ভ্ বা ওয়াইপ), তাহলে বুঝতে হবে চলচ্চিত্রকার সময়ের চলন বা ছন্দটাকে ধরতে বা ধরাতে চাইছেন একটু অন্যভাবে। ধরা যাক, ফেড্ আউট হয়ে কোনো দৃশ্য আলোকিত পর্দার বুক থেকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, আর তারপর সেই অন্ধকারের বুক থেকে ফেড্ ইন হয়ে ক্রমশ আলোয় উদ্ভাসিত হল অন্য একটি দৃশ্য। এখানে এক ধরণের পরিণতি এবং আর- এক আরম্ভের একটা তাৎপর্য সাধারণভাবে খুঁজে নিতে হয়। ঠিক যেন একটি পরিচ্ছেদ শেষ করে পাঠক চলে যাচ্ছেন অন্য-এক পরিচ্ছেদে। ডিজল্ভ্-এর ক্ষেত্রে ফেড্ আউট ফেড্ ইন-এর মধ্যে থাকে না সময়ের কোনো ব্যবধান— পর্দা অন্ধকার হয়না। এক্ষেত্রে একটি দৃশ্য যেন মুছে দেয় তার আগের দৃশ্যটিকে। যেন কাহিনীর একটি পর্ব বিলুপ্ত হয়ে গেল ঘটনাত্রম থেকে।

এইসব প্রযুক্তিভিত্তিক কৌশলের পাশাপাশি চলতে তাকে বোধভিত্তিক কিছু কৌশলের প্রয়োগ। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে য াওয়ার ব্যাপারটা বা দৃশ্যমালার সামগ্রিক বিন্যাসটি যাতে বিষয়গতভাবে দর্শকের তারিফ আদায় করতে পারে, সেকথ াও ভাবতে হয় চলচ্চিত্রকারকে। ফলে তাঁর দৃশ্যবিন্যাসের নক্সায় জায়গা পায় ধারাবাহিকতা (continuity), সামঞ্জস্য (symmetry), বৈপরীত্যে (contrast), সমান্তরতা (parallelism), প্রতীকধর্মিতা (symbolism), যুগপত্তা (simultaneity) বা একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি (leit motif)। এগুলো হতে পারে দৃশ্য-অন্তর্গত উপাদানকেন্দ্রিক, স্থ ানকেন্দ্রিক, গতি বা ছন্দকেন্দ্রিক।

সিনেমায় দৃশ্যনির্মাণের বা উপস্থাপনার এই ধ্রুপদী পদ্ধতিটি বহু সময় ধরে বির্বতিত হয়েছে, বিকশিত হয়েছে। গত শত াব্দীরবিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ এমনকি ষাটের দশকেও দেখা গেছে এবিষয়ের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এ হল সেই যুগ য

াকে বলা হয় চলচ্চিত্রবিষয়ে মুগ্ধতার যুগ। সেই মুগ্ধতার একটা বড়ো উপাদান তিলে তিলে গড়ে তোলা দৃশ্যের অ াবেদন। হলের আলো নিভে যাওয়ার পরে চলচ্চিত্রপ্রেমীরা নিঃসঙ্কোচে ডুব দিতেন সিনেমা নামের রূপের সাগরে। আর সেখান থেকে তুলে আনতেন রাশি রাশি মুক্তো। আজও অনেক প্রবীণ মানুষ আছেন আমাদের মধ্যে, সিনেমাকে যাঁরা ভ ালোবেসেছিলেন বিশ শতকের পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে। তাঁরা মজে গিয়েছিলেন সিনেমার রূপ আর বর্ণে। ভালো করে লক্ষ কণ তাঁদের চোখ। খুঁজে পাবেন অবিস্মরণীয় বহু দৃশ্যের ঘোর। রূপের মাধুরীতে কে না আবিষ্ট হন!

রূপের ব্যবচ্ছেদ

সিনেমাপাগল মানুষদের মধ্যে অবশ্য এমন অনেকে ছিলেন, সিনেমাকে ঘিরে মুগ্ধতাকে ছড়িয়ে যাঁদের মনে তৈরি হচ্ছিল অন্য উপলব্ধি। হৃদয় দিয়ে নয়, সিনেমাকে এঁরা বুঝতে চাইছিলেন মস্তিষ্ক দিয়ে। তাঁরাও নিশ্চয়ই আবিষ্ট হয়েছেন রূপের ম াধুরীতে। পাশাপাশি তাঁরা পৌঁছতে চেয়েছেন সেই রূপের গভীরে, নির্ধারণ করতে চেয়েছেন রূপের চরিত্র। তাঁদের মধ্যে একদল বললেন, যে সিনেমাআমরা দেখি, তার একটি গুত্বপূর্ণ দৃশ্যগত উপাদান হল মিজ-অঁ-সিন (mise-en- scene)। এর মূল আকর হিসেবে বিবেচিত হয়

সেটিং, লাইটিং, পোশাক-পরিচ্ছদ, দৃশ্যপটে বস্তু ও চরিত্রের পারস্পরিক বিন্যাস, আর চরিত্রগুলির আচারআচরণের ধ ারা। দৃশ্যপটে দর্শক যা দেখছেন, তার ওপর চলচ্চিত্রকারের কতটা নিয়ন্ত্রণ আছে, তা বোঝা যায় এই মিড-অঁ-সিন-এর মাধ্যমে। ক্যামেরার সামনে যে দৃশ্যটি উন্মোচিত হবে অথবা যে-ঘটনাটি ঘটবে, তার পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্য-অন্তর্গত এইসব বিষয়ের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেন চলচ্চিত্র-কার— অর্থের চাহিদা অনুযায়ী।

ধরা যাক সেট-এর কথা। থিয়েটারে সেট-এর ভূমিকা তার চেয়ে অনেক ব্যাপক আর গুত্বপূর্ণ। থিয়েটারে সেট হল অ াদতে ক্রিয়া বা অ্যাকশনের প্রেক্ষাপট। সেই সেট-এর আকার, আয়তন আর দ্রষ্টব্য স্থানটি নির্দিষ্ট। তার কোনো নড়চড় হয় না। কিন্তু সিনেমায় সেটকে ব্যবহার করা হয় অ্যাকশনের ধারক হিসেবে। এই সেট-এর সিনেমায় পরিধি অনেক বিস্তৃত। কারণ, দৃশ্যের প্রয়োজনে, অ্যাকশনের দাবিতে সচল ক্যামেরার সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে পারে সেট-এর অদৃষ্টপূর্ব নানা অংশ। একথাও মনে রাখা দরকার, ক্যামেরার কারিকুরিতে সিনেমার পর্দায় তৈরি করা হয় চলচ্চিত্রীয় পরিসর (cinematicspace)। এই পরিসর পুরোপুরি একটি কৃত্রিম সংগঠন। বাস্তবের সঙ্গে তার যোগাযোগ অনেক সময়েই ক্ষীণ। ধরা যাক, চিত্রনাট্যে বলা আছে একটি ঘর এবং সংলগ্ন বারান্দার কথা। শুটিং-এর সময় এই ঘর আর ওই বারান্দা দুটি পরস্পর সংলগ্ন না-ও হতে পারে। কিন্তু ক্যামেরার সামনে এই দুটি পরিসরের দৃশ্য-সংলগ্ন বলেই মনে হবে। অর্থাৎ সিনেমার সেটকে এক ধরণের ধারাবাহিকতা বা সামঞ্জস্যের দায়ও বহন করতে হয়। তাই সিনেমায় সেট নিছক এক ভৌত পরিসর নয়, অঙ্গাঙ্গী উপাদান।

সেট-এর প্রসঙ্গেই আসবে লাইটিং-এর কথা। আদি সিনেমার প্রসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পরিসরে ওপর থেকে আলো ফেলার কথা বলেছি আমরা। কিন্তু ক্যামেরা যখন থেকে দৃশ্যগঠনের সক্রিয় সহযোগী, তখন থেকেই দৃশ্যপটে আলোর ভূমিকা গেছে বদলিয়ে। আধুনিক সিনেমার দৃশ্যগঠনে আলোর ভূমিকাবহুমুখী। তা কেবল দৃশ্যগ্রহণের বাস্তব সহযোগীই নয়। একটি দৃশ্যের অভিঘাত কেমন হবে, তাও ঠিক করে দেয় এই আলো। আধুনিক সিনেমার পরিপ্রেক্ষিতে তাই আলোকস ম্পাত না বলে বলা উচিত আলোকবিন্যাস। সেই বিন্যাসে মূলসূত্রটি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট লাইটিং। এই ত্রিমুখী আলোকবিন্য াসের প্রথম উপাদানটি কী লাইট (key light)— যা দৃশ্যের কেন্দ্রীয়

বিষয়কে উদ্ভাসিত করবে। দ্বিতীয় উপাদানটি হবে ফিল লাইট (fillight)। চড়া কী লাইট-এর কারণে দৃশ্যের যেসব অংশ্য দৃষ্টিকটুভাবে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে যায়, সেইসব অংশে আলোছায়ার তারতম্যকে একটা সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসে এই ফিল লাইট।আর তৃতীয় উপাদানটি হচ্ছে ব্যাক লাইট (backlight) । ব্যাক লাইট-এর ব্যবহার হয় দৃশ্যের মধ্যে সেই গভীরতা আনার জন্যে, যে গভীরতার অভাব ছিল আদিযুগের সিনেমায়। তবে আলোকবিন্যাসের এই মূলসূত্রটিকে কাজে লাগিয়ে আরো নানা ধরণে-র লাইটিং প্যার্টান তৈরি করা যায়সিনেমার দৃশ্যপটে— চিত্রনাট্যের প্রয়োজন অনুযায়ী, চলচ্চিত্রকারের চাহিদা অনুযায়ী। আবার, একটি দৃশ্যের আলোকবিন্যাস শুধু সেই দৃশ্যের সঙ্গেই সম্পর্কিত নয়। ত াকেও, সেট-এরই মতো বহন করতে হয় সামঞ্জস্য বা ধারাবাহিকতার দায়।

সেট-এরই অন্য আর একটি উপাদান দৃশ্যপটে বিভিন্ন বস্তু ও চরিত্রের আকার এবং সংস্থান। এর সাহায্যে চলচ্চিত্রকার এগুলির আপেক্ষিক গুত্ব সম্পর্কে দর্শককে সচেতন করে দেন। সেট-এ এমন অনেক জিনিস ব্যবহার করা হয়, যেগুলো ত াৎক্ষণিকভাবে তৈরি করে নেওয়া হয়। এইভাবে তৈরি-করা জিনিসগুলোর আকার-আয়তন দৃশ্যপটের প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট বা বড়ো করা যায়। কিন্তু এমন অনেক জিনিসও সেট-এ ব্যবহার করা হয়, যেগুলির আকার বা আয়তন পূর্বনির্দিষ্ট। দৃশ্যপটের সংস্থান গড়ে ওঠে আকার ও অবস্থানের আপেক্ষিকতার ভিত্তিতে। এই আপেক্ষিকতাই অনেক ক্ষেত্রে দৃশ্যের ত াৎপর্যকে নির্দিষ্ট করে দেয়।

মিজ-অঁ-সিন-এর একটি গুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাত্রপাত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদই দৃশ্যপটে উপস্থিত পাত্রপাত্রীর বিষয়ে অনেক তথ্য দর্শককে দিতে পারে। তাদের সামাজিক অবস্থান, তাদের মনে একটা ধারণা তৈরি হয় তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে। আবার কাহিনী বা ঘটনার সময়, ইতিহাসের ক্ষণ, সামাজিক বিকাশের পর্যায়, এসব সম্পর্কেও দর্শকের ধারণা তৈরি হয় পাত্রপাত্রীর পোশাক থেকে।

পোশাক-পরিচ্ছদের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে চরিত্রগুলির আচার-আচরণের বিষয়টি। আচার-আচরণের মধ্যে পড়ে অভিব্যক্তি আর গতিবিধি। এগুলো হয়তো একই মুদ্রার দুই পিঠ। তবু অভিনেতা আর চলচ্চিত্রকারের কাছে এসবের অ াছে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। অভিব্যক্তির চর্চা আর গতিবিধির অনুশীলনে তাঁরা ব্যয় করেন অনেকখানি সময়। অবশ্য অভিব্যক্তি আর গতিবিধির সম্মিলনে গড়ে ওঠে এক সামগ্রিক অভিনয়শৈলী। এই শৈলী ধারণ করে চরিত্রানুগ অনুভব, রূপ দেয় সেই চরিত্রকেন্দ্রিক বিশেষ বিশেষ ভাবধারাকে। ফলে অভিনেতার অভিব্যক্তি আর গতিবিধি যেমন মিজ-অঁ-সিন-এর গ্রাফিক উপাদান, তেমনি তাঁর সার্বিক অভিনয়শৈলী হল মিজ-অঁ-সিন-এর অর্গ্যানিক উপাদান।

তবে এখানে বলে নেওয়া ভালো, মিজ-অঁ-সিন-এর আকারগুলি দৃশ্যপটে ঠিক আলাদা-আলাদাভাবে ক্রিয়াশীল হয়না। সেগুলি এক সার্বিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে এবং একত্রে ক্রিয়াশীল ও কার্যকর হয়।

দৃশ্য-অন্তর্গত উপাদানগুলির সংস্থান, পরিপ্রেক্ষিত, পুরোভূমি/পশ্চাদভূমির আপেক্ষিক সম্পর্ক, কম্পোজিশন-এর রৈখিক উপাদানগুলি (যার মধ্যে রঙ ও আলোও পড়ে) নিয়ন্ত্রণ করে মিজ-অঁ-সিন-এর স্থানিক বৈশিষ্ট্য। আর মিজ-অঁ-সিন-এর কালিক গুণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় মূলত গতির দ্বারা। এর মধ্যে পড়ছে দ্রুতি, অভিমুখ, ছন্দ, বর্ণবিন্যাসজনিত গতিময়তা, বিবিধ গতির তারতম্য ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ফ্রেমের ওপর দিয়ে দর্শকের দৃষ্টিপাতজনিত গতিময়তা ইত্যাদি।

নিছক দৃশ্যগত উপাদান হিসেবে মিজ-অঁ-সিনকে দেখলে বলতে হয় যে, এই পদ্ধতি সিনেমার বিভিন্ন অংশে রূপের উন্মে াচনে সাহায্য করে। কিন্তু একটি সিনেমার সামগ্রিক প্রেক্ষিতে এর আরো দুটি ভূমিকা আছে। প্রথমত, মিজ-অঁ-সিন সিনেম ার আখ্যান বা বিষয়কে ধারণ করে। দ্বিতীয়টি, তা দর্শকের আবেগকে আলোড়িত করে। ফলে মিজ-অঁ-সিনকে বাদ দিয়ে সিনেমার দৃশ্যগুণকে বোঝার চেষ্টা না- করাই ভালো।

রূপের সংগঠন

দৃশ্যের অন্য একরকম সংস্থান বা বিন্যাসের কথাও বলেন অনেকে। তাঁদের উপলব্ধিরও বাহন একটি ফরাসি শব্দ—মন্তাজ (montage) এর অর্থ একত্রীকরণ। একথা বললে অবশ্য মনে হতে পারে মন্তাজ মানে সম্পাদনাই — বিভিন্ন ফ্রেম, শট, ইমেজ আর

সীনকে একত্র করার কাজ। না, মন্তাজ ঠিক সম্পাদনা নয়, মন্তাজ হল সম্পাদনার এক বিশিষ্ট পদ্ধতি। সম্পাদনার সময় একাধিক ফ্রেম, শট, ইমেজ বা সীনকে বিন্যস্ত করে যখন এমন কোনো দৃশ্যমালা তৈরি হয়, যা একক দৃশ্যগুলির অতিরিক্ত কোনো ব্যঞ্জনা দর্শকের সামনে নিয়ে আসে, তাকে বলে মন্তাজ।

ধরা যাক, একটি দৃশ্য ক-কে সংযুক্ত করা হবে আর একটি দৃশ্য খ-এর সঙ্গে। সাধারণত সম্পাদক খুঁজে বার করেন ক অ ার খ-এর মধ্যে একটি যোগসূত্র (ধারাবাহিকতা, সামঞ্জস্য, বৈপ্যরীত্য ইত্যাদি।) এর ভিত্তিতে দৃশ্যদুটি সংযোজিত হয়। এই যোগসূত্রের ভিত্তি হতে পারে সময়, হতে পারে স্থান, হতে পারে ক্রিয়া, অথবা হতে পারে দৃশ্য-অন্তর্গত কোনো বস্তুর আকার বা মাত্রাও। এ সম্পাদনার এই ধ্রুপদী পদ্ধতির সার কথাটি হল এক দৃশ্য থেকে আর-এক দৃশ্যে গড়িয়ে চলা বা বয়ে চলা। যেমন গড়িয়ে যায় চাকা, বয়ে চলে জল, নদী। মন্তাজ-এ এ-পদ্ধতি অচল। মন্তাজ-এর সূত্রে ক এবং খ-এর

সংযুক্তি স্বাভাবিক কোনো ধারাবাহিকতাকে প্রকাশ করছে না। বরং তৈরি করছে একটি ধারণা, যাকে আমরা বলতে পারি গ। এখানে একথাও মনে রাখা দরকার, ক এবং খ নিছক ক্রিয়ামূলক বা উদ্দেশ্যমূলক কোনো দৃশ্য নয়। এই দৃশ্যদুটিকে হতে হবে ভাবের বাহন। ফলে ক আর খ-এর মধ্যে স্বাভাবিক কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া না-ও যেতে পারে। তাহলে কিসের ভিত্তিতে তৈরি হবে মন্তাজ?

মন্তাজ-পদ্ধতির পথপ্রদর্শক মানা হয় যাঁকে সেই লেভ কুলেশভ-এর ভাষায় যদি কারো কোনো ভাববন্ধ(ideaphrase) থাকে, যা গল্পাংশ অথবা সমগ্র নাটকীয় শৃঙ্খলার যোগসূত্র হতে পারে, তবে সেই ভাবটি প্রকাশ এবং জড়ো করতে হবে শট-সঙ্কেতগুলি (shot-ciphers) থেকে ঠিক ইঁট সাজানোর মতো করে।

কুলেশভ নিজে মন্তাজ পদ্ধতি নিয়ে বহু পরীক্ষা করেছিলেন। এগুলো কুলেশভ এফে* নামে পরিচিত। কুলেশভ-এর দুই উত্তরসুরী তাঁর মন্তাজ-তত্ত্বকে সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন—সেভোলোদ পুদোভকিন আর সের্গেই আইজেনস্টাইন। কিন্তু তাঁদের দুজনের ক্ষেত্রে প্রয়োগের পদ্ধতিটা দুরকমের বলে মনে করা হয়। কুলেশভ-এর প্রত্যক্ষ শিষ্য পুদোভকিন-এর মতে মন্তাজ হল সংযুক্তি (উনি নিজের লেখায় linkage শব্দটা ব্যবহার করেছেন)। অন্যদিকে আইজেনস্টাইন দাবি করেছেন, মন্তাজ হল সংঘাত বা সংঘর্ষ (ওঁর ভাষায় collision)। ভাষার এই তারতম্যের ফলে এই দুই দিক্‌পালের মধ্যে মতদ্বৈধের একটা আবহ তৈরি হয়েছিল। বলা হচ্ছিল, পুদোকিন-এর মতে ক + খ = গ, আর আইজেনস্টাইন-এর মতে ক × খ = গ। বিষয়টিকে অঙ্কের ভাষায় প্রতিস্থাপন করলে বেশ একটা মৌলিক পার্থক্যের সম্ভাবনা তৈরি হয়। কারণ সংখ্যার রাজ্যে যোগফল আর গুণফলের তফাৎটাই সাধারণভাবে চোখে পড়ে। ৭+৭=১৪ কিন্তু ৭×৭=৪৯। অবশ্য ২+২=৪, আবার, ২×২=৪ — এমনও তো হতে পারে। কিন্তু এটা নেহাৎই ব্যতিক্রম। ফলে মন্তাজ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংযুক্তি বনাম সংঘাতের বেশ একটা জবরদস্ত পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করা হয়েছিল, এখনো হয়।

যোগচিহ্ন, গুণচিহ্নের এই প্রতীকী লড়াইটাকে পাশে সরিয়ে রেখে আসল ব্যাপারটা নিয়ে আমরা যদি মাথা ঘামাই, তাহলে কিন্তু এই লড়াইয়ের উত্তাপটা থিতিয়ে পড়বে। মন্তাজ-এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ক এবং খ নামক দুটি দৃশ্যের সম্মিলিত পরিবেশনার ফলস্বরূপ দর্শকের ধারণার স্তরে একটি আকর্ষণীয় অভিঘাত। এখানে সম্মিলিত পরিবেশনার পদ্ধতি নিয়ে নয়, মাথা ঘামানো দরকার তার ফল নিয়ে। কারণ, দৃশ্য-সংযোজনের যে কয়েকটি প্রাথমিক উপায় আছে সম্পাদকের হাতে, তার সাহায্যেই করতে হবে মিলিত পরিবেশনা। সেখানে এমন তো নয় যে কাট্ মানে যোগ, আর ডিজল্‌ভ মানে গুণ। কাট্, ফেড্ ইন্, ফেড্ আউট, ডিজল্‌ভ্ বা ওয়াইপ — এগুলো হল দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার যান্ত্রিক উপায়। এক-একটি পরিপ্রেক্ষিতে এদের এক-একটি কার্যকর। এদের মধ্যে গুণগত কোনো তারতম্য নেই। আর সম্মিলিত পরিবেশনার অভিঘাত এইসব উপায়ের ওপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা নির্ভর করে নির্বাচিত দৃশ্যগুলির চাক্ষুষ ব্যঞ্জনা বা গুণগত মানের ওপর।

এখন প্রশ্ন, ফল হিসেবে আমরা কী পাই? তৃতীয় একটি দৃশ্য? তা তো নয়। আমরা পাই, ক আর খ-এর অস্তিত্বগত অর্থ আর রূপগত তাৎপর্যের অতিরিক্ত একটি ভাবনা। ভাবনা—যা কোনো ভৌত অস্তিত্ব নয়, দৃশ্যমানও নয়। সম্মিলিত পরিবেশনার অভিঘাতে এই যে ভাবনাটি আমাদের মস্তিষ্কে জন্ম নেয়, তার আবেশেই চাপা পড়ে যায় ক এবং খ-এর অব্যবহিত দৃশ্যগত ব্যঞ্জনা বা তাদের গুণগত মান। এই ভাবনাটিকেই প্রতীকী অর্থে বোঝানো হয় গ দিয়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, ক আর খ সমগোত্রীয় হলেও, গ তাদের সমগোত্রীয় নয়। ফলে তাদের নিয়ে যোগচিহ্ন, গুণচিহ্নের লড়াইটাও অর্থহীন। অর্থহীন তাই পুদোভকিন বনাম আইজেনস্টাইন-এর কাজিয়াও। দুজনে একই কথা বলেছেন— তবে বলেছেন ভিন্ন ভাষায়। আমরা যদি দুজনের লেখাগুলো একটু মন দিয়ে পড়ি, তাহলে আরো দেখতে পাব যে এই কাজিয়াটা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি। আইজেনস্টাইনকেই উদ্ধৃত করি

আমরা সামনে দুমড়ানো হলদে একফালি কাগজের ওপর একটি রহস্যময় লেখা

'সংযুক্তি—প (Linkage–P) অর সংঘর্ষ—আ (Collision-E)'। এটা 'আ' (অর্থাৎ আমার) এবং 'প' (অর্থাৎ পুদোভকিন) -এর মধ্যে মন্তাজ সম্বন্ধীয় উত্তপ্ত লড়াইয়ের বাস্তব চিহ্ন।

মন্তাজ হল এক সংঘর্ষ—আমার এই মতটাই তাকে (পুদোভকিনকে) আমি বোঝাতে চাইতাম। আমার মতে, দুটি প্রদত্ত বস্তুর সংঘাত (conflict) থেকেই ধারণা (concept) উদ্ভুত হয়। আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংযুক্তি হল একটি বিশেষ সম্ভাব্য

বিষয়মাত্র।

কী বোঝা যাচ্ছে এখানে? ভাষার মারপ্যাঁচে আইজেনস্টাইন এখানে 'সংঘাত'কে দেখিয়েছেন ব্যাপকতর অর্থবাহী এক পদ্ধতি হিসেবে। আর তাঁর মতে, 'সংযুক্তি' বহন করে একটি সঙ্কীর্ণ অর্থ। কিন্তু তাঁর কথায় এটা পরিষ্কার যে, প্রকৃত অর্থে তিনি যে 'সংঘাত'-এর কথা বলছেন, তার সঙ্গে তেমন কোনো বিরোধ নেই 'সংযুক্তি'-র ধারণার। বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে পুদোভকিন-এর লেখা পড়লে। এই লেখায় পুদোভকিন আইজেনস্টাইন-এর ছবি 'স্ট্রাইক' (১৯২৫) থেকেই দিচ্ছেন সফল মন্তাজের উদাহরণ

'স্ট্রাইক' ছবির শেষ দৃশ্যগুলোতে শ্রমিকদের গুলি করে হত্যার দৃশ্যের ফাঁকে-ফাঁকে কসাইখানায় ষাঁড়-জবাই করার কয়েকটি শট দেখানো হয়। ..... এই পদ্ধতি কোনো টাইট্‌ল ছাড়াই দর্শকের চেতনায় একটি বিমূর্ত ধারণায় জন্ম দেয়।

সিনেমায় আমরা প্রত্যক্ষ করি রূপের নানা বৈচিত্র্য। অনুভূমিক অক্ষের সঙ্গে সেখানে পাল্লা দেয় উল্লম্ব অক্ষ, পুরোভূমির সঙ্গে পশ্চাদভূমি, আকারের সঙ্গে আয়তন, মাত্রার সঙ্গে ঘনত্ব, ক্যামেরা-দুরত্বের সঙ্গে ক্যামেরা কোণ। সজীবতার আকারও আছে নানা মাত্রা। স্থিতি ও গতির, ধারাবাহিকতা ও ছন্দের, আলো ও ছায়ার, সাদা-কালোয়, রঙ-রঙহীনতায়। বিচিত্ররূপী, বহুমাত্রিক এই সব আকরের সৃজনশীল সম্মিলনই মন্তাজ। হয়তো একটু বেশি রহস্যময়; কিন্তু সেজন্যই বেশি আকর্ষণীয়।

রূপের চিহ

চলচ্চিত্র অনুশীলনের ক্ষেত্রে একটা জ্ঞানতাত্ত্বিক ছেদ এল বিশ শতকের সাতের দশক থেকে। ডল্‌ফ্‌ আর্নহেইম, বেলা বালাৎস, আঁদ্রে বাজাঁ প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের হাতে তৈরি হয়েছিল তত্ত্বভিত্তিক চলচ্চিত্র অনুশীলনের এক ঐতিহ্য। লেভ কুলেশভ, সেভোলোদ পুদোভকিন বা সের্গেই আইজেনস্টাইনও সেই ঐতিহ্যের শরিক। তবে আধুনিক গবেষকদের দল সেইসব তত্ত্বের গায়ে সেঁটে দিয়েছেন ধ্রুপদী ধারার তক্‌মা। আধুনিক চলচ্চিত্রতত্ত্বের অনুপ্রেরণা আসছে মূলত সংগঠনবাদ (Structuralism), ভাষাতত্ত্ব (Linguistics) আর চিহ্নতত্ত্ব (Semioties) থেকে। সাধারণ দর্শকের ক্ষেত্রে ততটা না হলেও একশ্রেণীর বোদ্ধা মানুষের কাছে সিনেমার তাৎপর্য বদলে যাচ্ছে। সিনেমায় মুগ্ধ হওয়ার দিন এখন শেষ। দৃশ্যনির্ভর মাধ্যম সিনেমাকে বোঝার জন্যে তৈরি হচ্ছে নতুন পদ্ধতি। সিনেমার গ্রহণযোগ্যতা আর নিছক দেখার স্তরে আবদ্ধ থাকছে না। সিনেমা হয়ে উঠছে একটি পাঠ বা text। প্রথম প্রজন্মের সিনেমা দর্শকরা দেখেছেন রূপের সজীবতা, যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'বায়োস্কোপ'।

তারপরের প্রজন্ম দেখেছেন চলচ্ছবি বা 'মুভিজ'। তৃতীয় প্রজন্মের দর্শক উপভোগ করেছেন কথা-বলা ছবি বা 'টকীজ'। পরবর্তী, অর্থাৎ চতুর্থ প্রজন্ম চাক্ষুষ করেছেন ফিল্ম বা সিনেমা নামের এক সুসম্বদ্ধ অস্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথের কথাটাকে একটু বদলে নিয়ে বলা চলে, সিনেমা হল 'দৃশ্যশ্রাব্যের গতিপ্রবাহ'। আর এখন, পঞ্চম প্রজন্মের কাছে সিনেমা হচ্ছে 'পড়া'-র বস্তু।

প্রশ্ন হল, কী হবে সেই 'পাঠ'-এর (বা পাঠের অর্থাৎ পড়ার) ভিত্তি? লিখিত বা মুদ্রিত পাঠ্যের ভিত্তি হল অক্ষর। সিনেমার ক্ষেত্রে কাকে বলা হবে অক্ষরের সমতুল্য? একটি ফ্রেম, একটি শট, একটি অ্যাকশন, একটি সীন, নাকি একটি সিকোয়েন্স? অথবা সিকোয়েন্সকেও ছাড়িয়ে আমরা পৌঁছে যাব সমগ্র একটি সিনেমায়— কিংবা একটি সিনেমাকেও অতিক্রম করে চলে যাব সিনেমার সামগ্রিক ভুবনে, চলচ্চিত্রভাষার বোধ আর সংবেদননির্ভর পরিসরে? কিন্তু না, এগুলোর কোনোটাই হবে না আমাদের বিচার-বিবেচনার প্রাথমিক ভিত্তি। আমরা শু করব 'চিহ্ন' থেকে।

এই 'চিহ্ন' নিছকই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো অস্তিত্ব নয়— যাকে দেখা যায়, বা শোনা যায় বা ছোঁওয়া যায়; কিংবা যার গন্ধ পাওয়া যায় অথবা স্বাদ পাওয়া যায়। 'চিহ্ন' হল এমন এক ত্রিস্তরীয় অস্তিত্ব, যার কিছুটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বাকিটা ধারণাভিত্তিক। 'চিহ্ন'-র অবশ্যই আছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি রূপ (আকার, মাত্রা, আর আয়তনের সমন্বয়)। কিন্তু এই রূপটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। 'চিহ্ন' নিজেকে ছাড়া অন্য কোনো কিছুর সঙ্গেও সম্পর্কিত। আবার, এই সম্পর্কের সূত্রেই তৈরি হয় 'চিহ্ন'-র তৃতীয় স্তর— তাৎপর্য, বা বলা ভালো ব্যবহারিকতা বা উপযোগিতার স্বীকৃতি। মানুষের বোধ ও অনুধাবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ত্র্যহস্পর্শে অর্থবহ হয়ে ওঠে 'চিহ্ন'—রলাঁ বার্থ একেই বলেছেন সাইন সিস্টেম বা চিহ্ন-পদ্ধতি।

বার্থ-এর দেওয়া সুপরিচিত একটি উদাহরণ আমরা এখানে পেশ করতে পারি। যে-কোনো একটি গোলাপ ফুল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের আধার। আমরা যখন বলি 'গোলাপ' তখন শ্রোতার মনে প্রথমেই রূপ নেয় গোলাপ ফুলের বাহ্যিক রূপ বা শরীর। এ হল 'চিহ্ন'-র প্রাথমিক স্তর। আবার ছাড়িয়ে সে হয়ে ওঠে মুগ্ধতার প্রতীক, ভালোবাসার প্রকাশ। কারণ, গোলাপের শরীরী অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সৌন্দর্যের সম্পর্ক। এ হল 'চিহ্ন'-র দ্বিতীয় স্তর। একই সঙ্গে প্রেমের স্মারক হিসেবে গোলাপের উপযোগিতার বিষয়টিকেও প্রেমিকা স্বীকৃতি দেয় তার গ্রহণের মাধ্যমে। তখন গোলাপ ছুঁয়ে যায় 'চিহ্ন'-র তৃতীয় স্তর।

ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ স্যস্যুর এই ত্রিস্তরীয় পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করেছেন আরো নির্দিষ্ট পরিভাষার ভিত্তিতে। তাঁর মতে, কোনো চিহ্নের শরীরী অস্তিত্ব (যেমন গোলাপের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটি) হল সূচক বা সিগ্‌নিফায়ার। আর প্রয়োগের মাধ্যমে সেই 'চিহ্ন'-র যে বৈশিষ্ট্যটি ফুটে ওঠে (যেমন, গোলাপের উদাহরণ মুগ্ধতার প্রকাশ ও তার স্বীকৃতি), তা হল সূচিত বা সিগ্‌নিফায়েড। এদুয়ের সেতুবন্ধন করছে যে স্তরটি (অর্থাৎ সৌন্দর্যের একটি প্রতীককে প্রেমিকার হাতে তুলে দেওয়া), তাকে স্যস্যুর বলছেন সূচনা বা সিগ্‌-নিফিকেশন। তাঁর মতে, এই 'সুচনা'-র তাৎপর্য সংস্কৃতিভেদে বদলে যায়। 'সূচক'-কে প্রকাশ করা ধরন। স্যস্যুর এর মতে, একটা সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে অনবরতই তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের 'সূচক'-আর 'সুচিত'-র পারস্পরিক সম্পর্ক।

এখন এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটাকে ছোট করে নিয়ে আমরা যদি শুধু সিনেমায় আবদ্ধ রাখি আমাদের দৃষ্টি, তাহলেও চোখে পড়বে চিহ্ন-পদ্ধতির নানা জটিল নক্সা। খুব চেনা ছবি থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। 'পথের পাঁচালি' (১৯৫৫) ছবিতে প্রসন্ন গুমশায়ের যেরূপটি আমাদের সামনে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, সেটি বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। পড়ানোয় ব্যস্ত গুমশাইয়ের অহরহ দাঁতখিচুনির পুনরাবৃত্তিতে (সূচক) তাঁর দাপট আর মেজাজের প্রমাণ পাওয়া যায় (সূচিত)। কিন্তু এই সূচনার অন্য-একটি মাত্রাও ধরা পড়ে, যখন একটা নুনের বস্তা থেকে কঞ্চির বেত তুলে নিয়ে পিঠ চুলকোতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন উনি। এখানে কঞ্চি তুলে নেওয়ার কাজটি (সূচিত) শু হয় অন্য-এক সূচক অর্থাৎ নুনের বস্তা থেকে। কঞ্চি তোলার কাজটি এখানে সূচিত হিসেবে তাঁর মেজাজের সঙ্গে মানানসই (সূচনা)। আবার পাঠশালায় নুনের বস্তার উপস্থিতি এবং কঞ্চি টানার তোড়ে তার থেকে নুন ছড়িয়ে পড়াও সূচিত হিসেবে আর একটি ভূমিকা পালন করে। আগের সূচনায় তা যোগ করে অন্য এক মাত্রা। রক্ষণশীল সমাজে পরিবর্তনের চাপে বিদ্যা আর ব্যবসা এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এত গভীর, প্রায় সমাজতাত্ত্বিক, একটি পর্যবেক্ষণকে কেবল একটি স্বল্পস্থায়ী অথচ অব্যর্থ চিহ্ন-শৃঙ্খলের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করে দেন সত্যজিৎ রায়। দৃশ্যের স্তর পেরিয়ে তা পৌঁছেযায় আমাদের মননে। দৃশ্যের সাহায্যে গড়ে তোলা এই চিহ্ন শৃঙ্খলটির যাথার্থ্য কিন্তু নির্দিষ্ট একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গেই সম্পর্কিত। এ হল বিশ শতকের বিশ বা ত্রিশের দশকে, বাংলার গ্রামসমাজ। শিক্ষা, অর্থকরী জীবিকা আর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি সেখানে প্রকট হচ্ছিল প্রথাগত কৌলিক বৃত্তির অবক্ষয়, কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতির দুর্দশা। এমন-এক সমাজের বাইরে আমাদের উল্লিখিত 'চিহ্ন'গুলির দ্যোতনা হারিয়ে যাবেই।

চিহ্নতত্ত্বের ব্যবহার সিনেমার দৃশ্যকে অন্য-এক ব্যঞ্জনায় মূর্ত করে তোলে। এই তত্ত্বের প্রয়োগ এখন আর বার্থ বা স্যস্যুর-এর বেঁধে দেওয়া পরিকল্পেই আবদ্ধ নেই। স্যস্যুর-এর সমসাময়িক আমেরিকান যুক্তিবিজ্ঞানী চার্লস পিয়ার্স চিহ্ন-শৃঙ্খল বা সূচনাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন প্রতিমা (আইকন), সূচক (ইনডে') আর প্রতীক (সিম্বল)। পিয়ার্স-এর মতে এই তিনটি শ্রেণী পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। প্রতিটি চিহ্নই যুগপৎ ধারণ করে আছে তিনটি বৈশিষ্ট্য। কেবল রূপের রাজ্যে তাদের কোনো একটি বৈশিষ্ট্য দর্শকের/গ্রাহকের,বা এক্ষেত্রে বলা উচিত পাঠকের, চোখে/কাছে প্রাধান্য পায়। পাঠক/দর্শক/গ্রাহক নিজস্ব বিচারবোধ অনুযায়ী প্রতিরূপ থেকে প্রতিমা, সূচক বা প্রতীকী অর্থকে গ্রহণ করেন, পরবর্তীকালে রেমন্ড ফার্থ এই তালিকায় যোগ করেছেন চতুর্থ একটি শ্রেণী—সঙ্কেত বা সিগন্যাল। তবে মূল বিষয়ে তিনি পিয়ার্স-এর সঙ্গে একমত 'চিহ্ন'-র সবকটি বৈশিষ্ট্যই হাজির আছে একটি দৃশ্যে; অপেক্ষা শুধু বেছে নেওয়ার।

এত কথার পরেও সহজ একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া এখনো বাকি! দৃশ্যের কোন্ (কোন্) উপাদানে আমরা খুঁজে পাব/নেব 'চিহ্ন'কে? ধ্রুপদী সম্পাদনায় যেমন দৃশ্যের বিন্যাস, মিজ-অঁ-সিন-এ যেমন দৃশ্য-অন্তর্গত বস্তুর বিন্যাস, মন্তাজ-এ যেমন শট-এর ভাব বা গুণ, চিহ্নতত্ত্বের জন্যে এমন কোন্ লক্ষণকে আমরা বেছে নেব বিচারের জন্যে? এবং কোথা থেকে

শু হবে আমাদের অনুসন্ধান? — একটি ফ্রেম-এ, একটি শট-এ, একটি অ্যাকশন-এ একটি সীন-এ, নাকি একটি সিকে য়েন্স-এ?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যে ফ্রেম-শট-অ্যাকশন-সিন বা সিকোয়েন্স ভিত্তিক প্রথাগত বিভাজনকে এড়িয়ে যাওয়াই ভ লো। আমাদের এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সিনেমাকে আমরা বলতে পারি দৃশ্যগত 'চিহ্'-র একটি বিশিষ্ট সমন্বয়। আমরা দেখেছি এইসব 'চিহ্'-র তাৎপর্য ভীষণভাবে নির্ভর করে নির্দিষ্ট একটি সাংস্কৃতিক পরিসরের ওপর, সেখ ানকার সামাজিক ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের ওপর। কিন্তু চিহ্ গঠনের কিছু সংস্কৃতি নিরপেক্ষ, বিশিষ্ট আকরকে আমরা খুঁজে নিতেই পারি, যেগুলোকে বলা হবে সিনেমায় সজীবতার চিহ্ বা উপাদান (signs or elements of plasticity)। এই অ াকরগুলোকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগও করে নিতে

পারি, কেননা খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় এই শ্রেণী বিভাজনই নির্ধারণ করে দৃশ্যের গুণাগুণ। তালিকাটি এইরকম

ক) অবয়বের মাত্রা — আকার, প্রকার, পরিমাণ, আয়তন, ঘনত্ব।

খ) অস্তিত্বের মাত্রা — ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক।

গ) গতির মাত্রা — বেগ, অভিমুখ, চলন, ধারাবাহিকতা, ছন্দ।

ঘ) রূপের মাত্রা — আলোর তীব্রতা (brightness) আলোছায়ার (contrast) তারতম্য, রঙের ব্যঞ্জনা (shade), রঙের তীক্ষ্ণতা (tone), রঙের বৈচিত্র্য।

সজীবতার এইসব চিহ্ সম্পর্কে দর্শক পাঠক, হিসেবে আমরা যে সব সময় খুব সচেতন থাকি, তা নয়। হয়তো এগুলো বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণের হাতিয়ার হিসেবেই বেশি কার্যকর। তবু কখনো যদি আগে দেখা কোনো একটি সিনেমা একাকীত্ব অথবা আড্ডার মধ্যেও উস্‌কে দেয় আমাদের স্মৃতি, তাহলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিভিন্ন দৃশ্যের কোনো না-কোনো (ক্ষেত্র বিশেষে একাধিক) মাত্রা। খুব সুসম্বদ্ধভাবে না-হলেও আমাদের সিনেমা-দেখার, দেখা-সিনেমার দৃশ্যগত নানা 'চিহ্' ছড়ানো থাকেই আমাদের মস্তিষ্কে।

রূপের মায়া

১৮৯০-এর দশকে ফিল্ম নামের যে নতুন মাধ্যমটি তার যাত্রা শু করেছিল, তার প্রথমপর্বের ব্যবহারকারীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাদুকর। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, এই মাধ্যমে নানা ধরণের দৃষ্টিবিভ্রম তৈরি করা যায়। ১৯০১ স ালেই ফরাসী চলচ্চিত্রকার (এবং যাদুকর) জর্জে মেলিয়ে তৈরি করেছিলেন 'দ্য ম্যান উইথ দ্য রাবার হেড'। এই ছবির একটি দৃশ্যে দেখা যায়, একজন খ্যাপাটে বৈজ্ঞানিক তাঁর নিজের মাথাটাকে টেবিলে রেখে হাওয়া দিয়ে ফোলাচ্ছেন আর মাথাটা বাড়তে বাড়তে শেষে ফেটে যাচ্ছে। সিনেমার পর্দায় মূলত ম্যাজিকই দেখাতে চেয়েছিলেন মেলিয়ে। কিন্তু তাঁর উত্তরসুরীরা যাদুকর না হয়েও অনেকক্ষেত্রেই অনুসরণ করেছিলেন তাঁর পদাঙ্ক — তাঁদের ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে, দৃশ্যনির্মাণের ক্ষেত্রে ঝুঁকি কমানোর তাগিদে। তাঁদের অধ্যবসায়ের ফলে তৈরি হয়েছে দৃশ্যনির্মাণের এক আশর্চ্য জগৎ। এখন আমরা জানি, দৈনন্দিন জীবনে যে দৃশ্যগুলিকে আমরা ব্যতিত্রমী বলি (যেমন দুর্ঘটনা বা বির্পযয়), অথবা যেসব দৃশ্য তৈরি হয় মানুষের কল্পনায় (যেমন রূপকথায় বা কল্পবিজ্ঞানে) তেমন দৃশ্য সিনেমার পর্দায় চাক্ষুষ করা সম্ভব। এমনকি সিনেমার পর্দায় দেখা যেতে পারে এমন দৃশ্যও, যা মানুষের কল্পনায়ও আসেনি এতদিন। তো, সিনেমার ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে এরকম ব্যতিত্রমী, অবাস্তব, কাল্পনিক বা অকল্পনীয় দৃশ্যের বহু উদাহরণ।

এসব হল সেই ধরণের দৃশ্য, যা নির্মাণ করার জন্য নানা কৌশলের শরণ নিতে হয়। চিরাচরিত পদ্ধতিতে সেট-এ ক্যামেরা বসিয়ে একটা পুরো ঘটনাকে এখানে ফিল্মবন্দি করা হয় না। এসব ক্ষেত্রে কখনো ব্যবহার করা হয় ক্যামেরার স্বাভাবিক কৌশলের অতিরিত্ত কিছু পদ্ধতি; কখনো সেট তৈরি করার বিশেষ কারসাজি। আবার কখনো ব্যবহার করা হয় নানা ম াপের মডেল—অভিনেতার বিকল্প হিসেবে। এরপরেও হয়তো ছবি তুলতে লাগে বিশেষ ধরণের ক্যামেরা, ল্যাবরেটরিতে ফিল্ম প্রসেস করতে হয় ব্যতিত্রমী কোনো পদ্ধতিতে; সম্পাদনার পর্যায়েও কাজে লাগানো হয় কিছু বিশিষ্ট কৌশল। এই সব মিলিয়ে স্পেশাল এফেক্ট। এমন কোনো ছবি আজ তৈরি হয়না যাতে ব্যবহার করা হয়নি একটিও স্পেশা এফেক্ট। আব ার মাঝেমাঝে এমন ছবিও আমরা দেখি যার পুরোটাই তৈরি হয়েছে স্পেশাল এফেক্ট দিয়ে। স্ট্যান্‌লি কুব্রিক-এর ছবি 'টু

থাউজান্ড ওয়ান আ স্পেস অডিসি' (১৯৬৮) থেকে অতি সম্প্রতি দেখা স্টিভেন স্পিলবার্গ-এর ছবি 'জুরাসিক পার্ক-৩' (২০০০) তৈরি করেছে এমন ছবির যে ধারাটির সূচনা, পূর্ব ইওরোপের কৃতী চলচ্চিত্রকারদের বিশিষ্ট অবদানের ফলে তা-ও এখন বিশাল মহীরূহ। এখন এধরনের ছবিতে স্পেশাল এফেক্ট সেই বিভ্রমকেই আরো গাঢ় করে তোলে। তবে এখন প্রতি পদে যেভাবে প্রসারিত হচ্ছে স্পেশাল এফেক্ট-এর দিগন্ত, তাতে অনতি- ভবিষ্যতেই হয়তো বদলে যাবে সিনেমার সংজ্ঞা। আর সেই সংজ্ঞার ভিত্তি হবে সজীব দৃশ্যের নির্মিতি আর তাৎপর্য নিয়ে তৈরি-হওয়া নতুন নতুন ভাবনা।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com